প্রথম অধ্যায়

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলার সামগ্রিক পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলার সামগ্রিক পরিচিতি
(General informantion about the area)

বীরভূম নামের উৎস সন্ধানে ঃ

মুণ্ডারি ভাষায় 'বির' শব্দের অর্থ জঙ্গল। অর্থাৎ জঙ্গলবেষ্টিত ভূমি বলে জেলার নামকরণ হয়েছে বীরভূম। পূর্বে এই স্থান যে প্রকার জঙ্গলবেষ্টিত ছিল এবং বর্তমানেও স্থানে স্থানে যে সব অঞ্চল জুড়ে জঙ্গল আছে তাতে বীরভূমকে 'বীরভুঁইয়্যা' বা জঙ্গলময় স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

আবার পূর্বে বীরাচার সম্মত ধর্মানুষ্ঠান বীরভূমে সমধিক প্রচলিত ছিল। তারাপুর, নলহাটি, লাভপুরের ফুল্লরা প্রভৃতি পীঠস্থান তার প্রমাণ। অনেকেই মনে করেন বীরাচারের প্রসিদ্ধ ভূমি বলে এদেশের নাম 'বীরভূমি' যা পরবর্তীকালে বীরভূমে পরিচিত হয়েছে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের 'ভবিষ্যপুরাণ' নামক একটি সংস্কৃত বইয়ে 'বীরভূম' নামটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের 'নাঢ়িকণ্ড' বা 'নাঢ়িক খণ্ড'-এ বীরভূমের নাম পাওয়া যায়।[২] আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে মাদারণ্ সরকারের ষোলটি মহালের মধ্যে বীরভূম নামে একটি মহালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাল থেকে দিল্লীর বাদশাহ আকবরকে ৪৯৫২২০ দাম রাজস্ব আদায় দেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রীগৌরীহর মিত্র লিখেছেন "পরবর্তী সময়ে এই বীরভূম মহালের সীমানা সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হইয়া তাণ্ডে সরকারের এব্রাহিমপুর, চোঙ্গ নদীয়া, দায়ুদ সাহী, স্বরূপ সিংহ, কুমার প্রতাপ, নওয়ানগর, জেন্নতাবাদ সরকারের সাহেজাদপুর, গোরাঘাট সরকারের ফতেপুর, সরিফাবাদ সরকারের সেরপুর আকবরসাহী এবং মাদারুন সরকারের বীরভূমি, নগর, সেনভূম প্রভৃতি মহাল লইয়া নূতন এবং স্বতন্ত্র জেলার সৃষ্টি হয়" (পৃ. ৫)। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে (১৭২৪-২৫ খ্রিঃ) বীরভূমি, মুর্শিদাবাদের অধীনে একটি বিখ্যাত জমিদারীর অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

বীরভূম জেলা রাঢ়ের অন্তর্গত, বিশেষত উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। 'জৈন আচারাঙ্গ' সূত্রের একটি কাহিনিতে বলা হয়েছে মহাবীর জিন এসেছিলেন রাঢ়দেশের কোন এক অঞ্চলে, যে অঞ্চলের নাম বলা হয়েছে বজ্রভূমি।[৩] "বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভূমি যথার্থতই বজ্রভূমি" বলে মনে করেন নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় (বাঙ্গালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৬০)। এই বজ্রভূমি পরে বীরভূমি বা বীরভূমে পরিণত হয়। মিথিলার পর হতে গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল উড়িষ্যা পর্যন্ত 'রাঢ়' বলে খ্যাত ছিল। এই রাঢ় দেশ পরবর্তীকালে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 'উত্তর রাঢ়' ও 'দক্ষিণ রাঢ়' এই দুটি ভাগে চিহ্নিত হয়। আমাদের বীরভূম, এই উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত। শ্রীগৌরীহর মিত্র মহাশয় 'কুলপঞ্জিকা'র একটি শ্লোককে

উল্লেখ করেছেন যেখানে বীরভূম পূর্বে 'কামকোটি' নামে খ্যাত ছিল।

"বীরাভূঃ কামকোটিঃ স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা।
আরণ্যকঃ প্রতীচ্যাঞ্চ দেশো দার্যদ উত্তরে।
বিন্ধ্যাপাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহবঃ স্থিতাঃ।"

—এর পূর্বে অজয় সম্মিলিত গঙ্গা, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের ঘন অরণ্য, উত্তরে রাজমহলের পর্বত শ্রেণি বা পাথরের দেশ এবং দক্ষিণে বিন্ধ পর্বত থেকে উদ্ভবা দামোদর। তবে কামকোটি এবং বীরভূমি যে একই স্থান তা মহেশ্বর বিরচিত 'কুলপঞ্জিকা' তে পাওয়া যায় — "কামকোটি বীরভূম জানিবে নির্যাস।"[৪] কামকোটি নামে কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না বলে মনে করেছেন বীরভূমের ইতিহাসকার শ্রীগৌরীহর মিত্র, কিন্তু ড. পঞ্চানন মণ্ডল 'বীরভূমি' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন দেউলী কাঁকোটি বা কামকোটি গ্রাম অজয় তীরে অবস্থিত ছিল, যেখানে "গুপ্তযুগের নির্মিত শামা কালীর মূর্তি এখনও বিরাজমান" এবং "কাম শব্দটি হল শ্রমণ বা শামা শব্দের রূপান্তর" ও কোটি হল "কোট" বা "দুর্গ"।[৫]

বীরভূম জেলার নামের উৎস সন্ধানে আরও কয়েকটি মত পণ্ডিত মহলে প্রচলিত আছে। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বীরসেন নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁরই উত্তরপুরুষ সামন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাস সেন, লক্ষণ সেন। তাদেরই পূর্ব পুরুষ, বীরসেনের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম 'বীরভূম' নামে খ্যাত।

নামকরণে আর একটি মতের পিছনে কিংবদন্তী লোকশ্রুতি আছে বলে মনে করেন বীরভূমের ইতিহাসকার শ্রীগৌরীহর মিত্র। কিন্তু অন্য এক ঐতিহাসিক এবং ক্ষেত্রগবেষক অর্ণব মজুমদার 'বীরভূম ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখছেন — "আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বীরভূমে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষী দুইজন ক্ষত্রিয় — বীরসিংহ ও চৈতন্য সিংহ। এই সময়ে লক্ষ্মণ সেনের প্রশাসন শিথিল হয়ে পড়েছিল। নানাস্থানে স্থানীয় শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বীর ও চৈতন্য সিংহ বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলে দুটি স্বাধীন কর্তৃত্ব গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বর্ধমানের চৈতন্যপুর ছিল চৈতন্য সিংহের রাজধানী আর বীর সিংহের রাজধানী ছিল সিউড়ির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বীরসিংহপুর। পরবর্তীকালে তুর্কি আক্রমণে বীর সিংহ নিহত হলেও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন নগরে। বীরসিংহের এই বংশধরেরা পরিচিত ছিল বীররাজা হিসাবে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাদের স্বাধীন কর্তৃত্ব বর্তমান ছিল। খুবই স্বাভাবিক ভাবেই বীররাজাদের রাজ্য পরিচিত হয়ে উঠেছিল বীরদেশ বা বীরভূম নামে। দ্বাদশ-এয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত নগরকে কেন্দ্র করে বর্তমান বীরভূমের এক বড় অংশ স্বাধীন শাসন পরিচালিত করেছিল বীররাজা নামে অভিহিত এক হিন্দু রাজবংশ। আর এই রাজবংশের নামে তাদের শাসিত দেশ বা ভূমি পরিচিত হয়ে উঠেছিল বীরভূম নামে।" শ্রী অর্ণব মজুমদারের মতে অনেকে 'বীরভূম' নামকরণটির পিছনে সাঁওতালি শব্দ 'বির' যার অর্থ জঙ্গল ও 'ভূমি' বা ভূম — এই উভয়ে মিলে 'বীরভূমি' বা 'বীরভূম' হয়েছে বলে মনে করেন, সেটি যথার্থ নয়। কারণ ড. অর্ণব মজুমদারের

মতে ছোটনাগপুর থেকে বৃহত্তর বীরভূমে এসে সাঁওতালরা বাস করেছে মাত্র দুই আড়াইশ বছর আগে। বীরভূমে আসার আগে তারা যে সমস্ত জঙ্গলে দীর্ঘকাল বাস করেছিল সেগুলির নামকরণ সাঁওতালদের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার থেকে হয়নি।[৬] এ প্রসঙ্গে মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী 'বীরভূম রাজবংশ'-তে লিখছেন — "সাঁওতালগণ আপনাদের অসংস্কৃত ভাষায় 'বীর' শব্দের সঙ্গে যে সংস্কৃত 'ভূমি' বা 'ভূম' শব্দের মিশ্রণ করিয়াছিল তাহার সঙ্গত কারণ অনুমিত হয় না। সোজাসুজি নিজ ভাষাতেই সম্পূর্ণ নামটি রাখা স্বাভাবিক।"

বীরভূম নামটি যে সতেরো শতকে পশ্চিম থেকে আগত সাঁওতালরা আসার অনেক আগে থেকেই মোটামুটি একাদশ শতকেও পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিমত পোষন করেন ড. অর্ণব মজুমদার।

ইতিহাস ও সংস্কৃতির সন্ধানে ঃ

জৈনদের 'আচারাঙ্গ' সূত্রে উল্লেখ আছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর জিন পথহীন 'লাঢ়' তথা রাঢ়দেশ 'বজ্জভূমি' যার অন্তর্গত বীরভূমও পড়ে সেখানে প্রচারের জন্য যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন সেইসব স্থানের অনেক অধিবাসীরা তাঁকে আক্রমণ করেন।[৭] কতকগুলি কুকুরও মহাবীরকে আক্রমণ করে কিন্তু কেউই এই কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে দেয়নি। উপরে উল্লেখিত 'বজ্জভূমি' পরে হয় 'বৈরভূমি' বর্তমানে বীরভূম।[৮] বজ্জভূমির পূর্বসীমায় ভাগীরথী, দক্ষিণে সুহ্মভূমি বা সিংহভূমি এবং পশ্চিমে মল্লভূমি, গোপভূমি ও বীরভূমি। 'আচারাঙ্গ' সূত্র অনুসারে বলা যায় যে, সে সময়ে (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) বীরভূম অঞ্চল প্রসিদ্ধ ছিল বজ্রভূমি হিসাবে। একথা প্রমাণিত যে বীরভূমে বিভিন্ন সময় জৈন সম্প্রদায়ের বহু তীর্থঙ্কর এসেছেন জৈন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। বর্তমানেও নানা স্থানে জৈনধর্মের নানা কীর্তি ছড়িয়ে আছে। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের অন্তর্গত মহম্মদ বাজারের মহাবীরপাহাড়ী নামটি নিঃসন্দেহে তীর্থঙ্কর মহাবীরের নাম অনুযায়ী। রাঢ় বাংলার এক প্রখ্যাত গবেষক ড. সুধীর কুমার করণ 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত মল্লারপুরে মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের একটি কক্ষে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট এক দেবমূর্তিকে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি বলে অনুমিত হয়।" এ ছাড়া তিনি আরো বলেছেন "বীরভূমে যে সব মূর্তি অবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই ঋষভনাথ, আদিনাথ, শক্তিনাথ, সোমনাথ ও পার্শ্বনাথের। পার্শ্বনাথের মূর্তির সংখ্যাই বেশি (সীমান্ত বাংলার লোকযান, পৃ. ২২)।" প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে মহাবীর বীরভূমের সাদীনপুর, পাইকর (জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত পওকালয়) সুমারপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন এবং ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে' যে শ্রাবক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে তারা ছিলেন জৈন ধর্মগুরুদের অনুগামী। এই সম্প্রদায় বর্তমানে অপভ্রংশে 'শরাক' নামে পরিচিত। বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে এই সম্প্রদায়ের এখনও দেখা পাওয়া যায়। বীরভূমে জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ১৯৯১ সালের জন গণনা অনুযায়ী ১৮১২ জন এবং ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১৪০৮ জন।[৯] বীরভূমের নানা স্থানে মনসা ও কালভৈরব পূজিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে

জৈনদের অবলুপ্তির পর পার্শ্বনাথসহ জৈন সাধকদের মূর্তিগুলি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে মনসা ও কালভৈরবে।[১০]

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতক থেকে বীরভূম জেলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। বীরভূমের বহুস্থানে বর্তমানেও বাসুদেবের মূর্তি কালের ঝড় ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে আজও টিকে আছে। হিন্দু বিষ্ণুমূর্তি বাসুদেবে পরিণত হয়েছে। তন্ত্রের আধারে তারাদেবী ও সরস্বতী বিনির্মিত হয়েছেন মহোত্তরী তারা ও নীল সরস্বতী রূপে। বীরভূমে ছিল প্রায় হাজার বছরের বৌদ্ধ উপনিবেশ। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের অন্তর্গত লোহাপুর ব্লকের বারা গ্রামে ছিল বজ্রযানী বৌদ্ধদের একটি বিশিষ্ট ধর্মক্ষেত্র বা সাধনপীঠ।[১১] বারাগ্রামে ও তীরগ্রামে কুড়ি-একুশটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি বৌদ্ধদেবী ভুবনেশ্বরীর ছবি পাওয়া গেছে। এছাড়া ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকের অধীন কলেশ্বর গ্রামে প্রায় সাড়ে তিনহাত উচ্চতা বিশিষ্ট অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত বাসুদেব মূর্তিটি আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। এছাড়া পাইকর, বীরচন্দ্রপুর, নন্দীগ্রাম, ঢেকা, ঘোষগ্রাম, রাংতরা, ভদ্রপুর প্রভৃতি গ্রাম যা আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত সেখানেও বিষ্ণুমূর্তির আদলে একশোটিরও বেশি বৌদ্ধ বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গেছে। লোহাপুর ব্লকের অন্তর্গত ভদ্রপুর থেকে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই শিলাময়ী মূর্তির শিরোভাগে অমিতাভ বুদ্ধচিহ্নিত ও সমাধি মুদ্রায় স্থিত আছে।[১২] বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা একসময় যেমন ধর্মঠাকুরের পূজা করতেন তেমনি বহু বুদ্ধমূর্তিও বিভিন্ন স্থানে ধর্মঠাকুর হিসেবে বর্তমানে পূজিত হয়। এমনকি অনেক স্থানে বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজাও বৌদ্ধ প্রভাবজাত বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১৩] বীরভূম জেলায় দশম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা বজ্রযানী এবং সহজযানী সম্প্রদায়ের স্বর্ণযুগ ছিল। বজ্রযানীদের মতো কঠোর অনুশাসন সহজযানীরা মেনে চলতেন না। সহজযানীরা সহস্র শতকের ঝড় ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে হিন্দু বৈষ্ণব সমাজের তিলক ও আলখাল্লা পরিধান করে তাদের উদার চৈতন্যকে সগৌরবে বজায় রেখেছেন। এই সম্প্রদায় মান্য করতেন জীবনসত্য ও প্রাণের নিগূঢ় ধর্মকে। যা এখন মেনে চলেন বীরভূমের চারিচন্দ্রভেদি বাউল সম্প্রদায়। সহজযানীদের ভাবাদর্শ পৌঁছে গেছে মানবতাবাদে, যার মূল কথা — "সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।"

রাঢ় অঞ্চলে মৌর্য বা শুঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন প্রামাণ্য নথি নেই। কিন্তু গুপ্তযুগের সভ্যতা হিসেবে বারা ও নানুর সুখ্যাত। উভয় জায়গা থেকেই গুপ্ত বংশের রাজা বালাদিত্য উপাধিধারী নরসিংহ গুপ্তের নামাঙ্কিত একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্তবংশের রাজারা বারাও তার নিকটে নগরা প্রভৃতি অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন বলে কথিত আছে।[১৪] চন্দ্র বর্মার অধস্তন উত্তরপুরুষেরা এই জেলার নলহাটি, নানুর এবং সন্ধিগড়া বাজারে বসবাস করতেন বলে অনুমিত হয়।[১৫] এছাড়াও আরো জানা যায় যে পরবর্তীকালে শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ থেকে বীরভূমের পূর্বাংশ শাসন করতেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর চীনা পর্যটক হিউ-এন-সাঙ ক-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাংলায় আসেন। ক-জঙ্গল ভূমি অরণ্যাবৃত,ঊষর এবং লৌহ আকরযুক্ত। বর্তমান বীরভূমের মুরারই, নলহাটি এবং রামপুরহাট থানা ক-জঙ্গল মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল।

এরপর বীরভূমের পালরাজারা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসনকর্তা ছিলেন।

পালযুগের প্রামাণ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে মুরারই থানার অধীন পাইকর গ্রামে।[১৬] এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে চেদীপতি কর্ণদেব, নয়পালের রাজধানী আক্রমণ করেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি। কথিত আছে অতীশ দীপংকর নামক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত উত্তর রাঢ়ের পাইকর অঞ্চলে উপস্থিত হলে নয়পাল ও চেদী রাজার মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করে দেন যা বর্তমানে 'মিত্রপুর' নামে অখ্যাত এক গ্রাম যা মুরারই থানার অধীন, ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। এছাড়া পালযুগেই বীরভূমের সুরথেশ্বর, ডাবুকগ্রামের ডাবুকেশ্বর প্রভৃতি স্থানের শিবমন্দির গুলি নির্মিত হয়েছিল।

পাল রাজাদের শাসনব্যবস্থায় শিথিলতার সুযোগে কর্ণাট থেকে আগত যোদ্ধাদের এক শাখা দামোদর-অজয় নদীর উপত্যকায় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় হেমন্ত সেন নামে এক রাজা দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র বিজয় সেনও মুরারই থানার বীরনগর ছেড়ে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। তাঁর বীরযোদ্ধা মন্ত্রী পাহি দত্তের নামে বর্তমানে 'পাইকর' নামে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। পাইকরের একটি ভগ্নস্তম্ভ লিপিতে রয়েছে "রাজেন্দ্র শ্রী বিজয় সেন" (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ. ২৭৬)। এতেই প্রমাণিত হয় বিজয় সেন পাইকরে কিছু দেবতার মন্দির স্থাপন করে থাকবেন। সেন রাজাদের স্মৃতি হিসেবে বল্লাল সেনের বল্লারপুর উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণসেন ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা।

এরপর আসে মুসলমান যুগ। মোঘল শক্তির প্রভাব বীরভূমে খুব একটা পড়েনি। রাজনগরে জোনেদ খাঁ ষোড়শ শতকের আশির দশকে নগরের বীররাজাকে হত্যা করে শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। পাঠান ফৌজদারগণের রাজত্বকাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পাঠান বংশের আলিনকি খাঁ সিরাজদৌলার সঙ্গে বর্গি বিতাড়নে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলকাতা আক্রমণে যোগ দেন। পাঠান ফৌজদারদের রাজধানী ছিল 'লক্ষুর' বা 'নগর' যা বর্তমানে রাজনগর নামে পরিচিত। বীরভূমের রাজাদের মধ্যে রাজনগরের পাঠান ফৌজদারদেরই একমাত্র কামান ও গোলা তৈরির কারখানা ছিল। রাজনগরের তোপখানা এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

১৭৫৭ -র পর থেকেই বীরভূমেও শুরু হয় ইংরেজ শাসন। বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় কুঠি স্থাপন করে তারা জনগণের উপর অত্যাচার চালায়। গুনুটিয়া, নারায়ণপুর, সুপুর, রায়পুর, ইটাণ্ডা, ইলামবাজার প্রভৃতি জায়গায় ছিল ইংরেজদের কুঠিবাড়ি। ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরভূমের কৃষক সমাজের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটল ১৮৫৫ সালে। যা ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের প্রাক্‌কালে বীরভূমের উপজাতীয় কৃষক ও তাঁদের সহযোগী অ-উপজাতীয় গরীব কৃষক, বিধ্বস্ত তাঁতশিল্পের শিল্পী জোলা সম্প্রদায়, লোহার পিণ্ড সংগ্রাহক ও উৎপাদক কামার লোহার প্রভৃতি মানুষেরা, গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষেরা, ঐ বিদ্রোহের শরিক হলেন, প্রাণ দিলেন। অনেকে নিষ্ঠুর কারাদণ্ড ভোগ করলেন। মহাজনেরা সাঁওতালদের নানাভাবে শোষণ ও অত্যাচার করত।[১৭] এই জেলার নলহাটি, রামপুরহাট, রাজনগর, মহম্মদবাজার, লাঙ্গুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম সাঁওতাল, অ-সাঁওতালেরা দখল করে নিয়েছিল।[১৮] নারায়ণপুরের কামারেরা বিদ্রোহীদের তিরের ফলা বানিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহের নেতাদের সঙ্গে

রাজনগরের কাছে কুশকর্ণী ও সিদ্ধেশ্বরী নদীর তীরে ইংরেজদের প্রবল লড়াই হয়েছিল। এই লড়াইয়ে বন্দুকের বিরুদ্ধে তির-ধনুক লাঠি নিয়ে, সাঁওতালরা লড়ে উঠতে পারেনি। জমিদারি ও মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে এবং দেশের স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অসীম বীরত্বপূর্ণ ও সংঘবদ্ধ লড়াই —যাতে সামিল হয়েছিল বীরভূমের একটা বৃহত্তর অংশের মানুষ তাদের কথা যেন আজ অনেকটাই ধূলি ধূসরিত, কালের গর্ভে বিলীয়মান।[১৯]

প্রাক্‌স্বাধীন যুগে 'অনুশীলন' এবং 'যুগান্তর' দুটি দলই স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করেছিল। ভালাস, যোগাই, জাজিগ্রাম, ঝাউপাড়া গ্রামে বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল। এই জেলায় দুকড়িবালা, পান্নালাল দাশগুপ্ত, বিনয় চৌধুরী,নিশাপতি মাঝি, রাধানাথ চট্টোরাজ, হংসেশ্বর রায়, গোপিকা বিলাস সেন, লালবিহারী সিংহ, যুগলপদ দাস, কামদাকিংকর মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা চক্রবর্তী, সমাদীশ রায়, প্রভাত ঘোষ, শরদীশ রায়, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ আলি, আব্দুল হালিম প্রভৃতিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে মনোনিবেশ করেছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তর বীরভূম জেলায় বামকৃষক আন্দোলন হয়েছে আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত নলহাটি থানার ধরমপুর, মহম্মদবাজার থানার ডামরা প্রভৃতি গ্রামে। নকশাল আন্দোলনের জোয়ারও ছিল জেলা জুড়ে।

প্রত্নতত্ত্বের পীঠস্থান হিসেবে বীরভূম অগ্রগণ্য। বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত ইলামবাজার ব্লক। ইলাম বাজারের একটু দূরেই অধুনা বিখ্যাত পাণ্ডুরাজার ঢিবি। উৎখননের ফলে এখান থেকে যে সব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তার বয়স খ্রীস্টপূর্ব ১২৫০/১২০০।[২০] প্রায় তিনহাজার দু'শো বছর পূর্বের বীরভূমে প্রত্নাশ্মীয় পর্বের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে কৃষ্ণ লোহিত মৃৎপাত্রের ছোট ছোট টুকরো, নরকঙ্কাল সমেত কয়েকটি সমাধি, ক্ষুদ্রাশ্মের তৈরি কারু যন্ত্র, শ্বেতাভ চিত্ররেখাঙ্কিত ঘন ধূসর রঙের মৃৎপাত্রের টুকরো, জলনালিযুক্ত মৃৎজলপাত্র, পেঁচানো সর্পিল বালা, আংটি, কাজল লাগাবার কাঠি, তামার বঁড়শি, সরলরেখায় অনেকগুলি সুবিন্যস্ত গৃহতল, পোড়ামাটির টালির বড় টুকরো, একপদী মৃৎভাণ্ড, পশুর হাড় বা শিং দিয়ে তৈরি বড় সূঁচ জাতীয় যন্ত্র, লোহার তৈরি কয়েকটি ছোট ফলা, লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি, ছোট তরোয়াল, স্ফীতবক্ষ নারীমূর্তি, একসারি মাছ, গোল শিলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এই স্থানে মানুষের সামাজিক ইতিহাস থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানকার মানুষ যন্ত্রপাতি নির্মাণে শুধু পাথর মাত্র ব্যবহার করছে না সঙ্গে সঙ্গে তারা তামার ব্যবহার ও শুরু করছে। এই স্থানের জনজীবনের প্রধান লক্ষণ চাষের প্রবর্তনা, স্থায়ী বসতি ও বাস্তু নির্মাণ, গৃহপশু পালন, সমাজ নির্মাণ। তাই বাঙ্গালীর ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন — "এই রূপই বাঙালীর আদি ইতিহাসের রূপ", যা একদা শুরু হয়েছিল বীরভূম থেকে।

বোলপুরের কাছে কোপাই তীরবর্তী মহিষদল গ্রামে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে সেগুলি খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দ হতে খ্রিস্টপূর্ব ৮৫৫ অব্দের মধ্যে।[২১] এখানেও পাওয়া গেছে নলখাগড়ার দেওয়ালওয়ালা ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ধারালো ফলার যন্ত্রপাতি, তাম্রকুঠার, মৃন্ময় লিঙ্গ, হাড়ের তৈরি দ্রব্য, অলঙ্কৃত চিরুনিখণ্ড, চুড়ি, তির, বর্শাফলক, খনিত্র, কীলক ইত্যাদি।

লোহা এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর-আয়ুধের ব্যবহার এই পর্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রত্নসামগ্রীর নিদর্শন থেকে একথা প্রমাণিত যে "এই অঞ্চলেই ইতিহাসের তাম্রাশ্মীয় পর্বের বাঙালী বসতি স্থাপন করে বাস্তু তৈরি করে শস্যোৎপাদন, পশুপালনে এবং সমাজগঠনে প্রথম অভ্যস্ত হয়েছিল।"[২২]

এছাড়া বোলপুর থানার অন্তর্গত দেউলী, নানুর থানার অন্তর্গত নানুর, কীর্ণাহার ও বেলুটি, ইলামবাজার থানার অন্তর্গত মুন্দিরা, সিউড়ি থানার অন্তর্গত হারাইপুর এবং ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত কোটাসুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে তাম্র-প্রস্তর যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলার ভৌগোলিক পরিচিতি ঃ

আমরা আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে যে অংশটিকে বেছে নিয়েছি তা হল ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলা। ময়ূরাক্ষী নদী পশ্চিম থেকে পূর্বগামিনী হয়ে সমগ্র বীরভূম জেলাকে প্রায় সমান উত্তর এবং দক্ষিণ দুটি ভাগে ভাগ করেছে। আমাদের ভাষা সমীক্ষার ক্ষেত্রটি হল ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর অংশ যার মধ্যে পড়ে রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এবং সিউড়ি সদর মহকুমার অন্তর্গত মহম্মদবাজার ব্লক ও সাঁইথিয়া ব্লকের অন্তর্গত হরিসরা ও দেরিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ছাব্বিশটি গ্রাম। সমগ্র এলাকাটির আয়তন ১৯১৩.৬৪ বর্গ কিমি।[২৩] রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত মোট ৮ টি ব্লক এবং ৫ টি থানা আছে। ব্লকগুলি হল মুরারই — ১ নং এবং ২ নং, নলহাটি — ১ নং এবং ২ নং, রামপুরহাট — ১ নং এবং ২ নং, ময়ূরেশ্বর — ১ নং এবং ২ নং। থানাগুলি হল মুরারই, নলহাটি, রামপুরহাট, মাড়গ্রাম এবং ময়ূরেশ্বর। আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে মহম্মদবাজার থানা অবস্থিত। ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে বীরভূম জেলায় আটশত আশিটি গ্রাম আছে।[২৪] আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে দুটি পৌরসভা আছে। সে দুটি হল — রামপুরহাট এবং নলহাটি পৌরসভা।

আমাদের সমীক্ষান্তর্গত ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অবশিষ্ট বীরভূম জেলা সহ সাঁইথিয়া ব্লক, লাভপুর ব্লক এবং সিউড়ি ১ নং ব্লক। পশ্চিম দিকে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলা অবস্থিত। উত্তর দিকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা, এবং পূর্ব দিকেও মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রটি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে এসে অনেকটা ত্রিভুজের কোনাকৃতির মতো হয়েছে। আমাদের ভাষা সমীক্ষার ক্ষেত্রসহ বীরভূম জেলার একটি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে চিত্রসূচি ১-এ।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমাদের আলোচ্য অংশকে তিনভাগে ভাগ করা যায় — পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব। পশ্চিম ও মধ্য বিভাগের অর্ধাংশ ছোটনাগপুর মালভূমির ক্রমবিস্তার। পূর্বভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি তৈরি হবার ভূ-আলোড়নের কিছু প্রভাব আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের পশ্চিম অংশে পড়েছে। তাই এই অঞ্চলগুলির পশ্চিম ভাগে ঢেউ খেলানো উঁচু-নিচু ভূমির নিচে জমা রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরের স্তর। বিজ্ঞানীদের মতে যার বয়স নব্বই কোটি বছর এবং সেগুলি আরকিয়ান যুগের।[২৫] আমাদের ভাষা সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত উত্তর

এবং পশ্চিম অংশে রয়েছে জুরাসিক যুগের আগ্নেয় শিলা যা প্লাইস্টোসীন পর্বের অন্তর্গত পুরা পলিভূমি (older Alluvium)।[২৬] রামপুরহাট থানার পশ্চিমাংশে অবস্থিত শিয়ালডাঙ্গা, বারোমাসিয়া, সাগরবানডি, মলুটি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বিভিন্নস্থানে আরকিয়ান যুগের শিলারাশি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। জুরাসিক যুগের আগ্নেয় শিলাগুলি ল্যাটেরাইট মৃত্তিকারূপে এবং আরো নিচে শক্ত পুরু কালো পাথর হয়ে চাপা রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাগুলিকে 'মুরাম' এবং কালো শক্ত পাথরকে 'বেলেশ পাথর' বলে। এরকম মুরাম রামপুরহাট ১ নং ব্লকের এবং মহম্মদবাজার ব্লকের পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে বর্তমান। আর ল্যাটেরাইটের নিচে কালো পাথর সদ্য বর্ণিত অঞ্চলগুলি ছাড়াও নলহাটি ব্লকের পশ্চিমাংশে দীর্ঘ স্থান জুড়ে প্রোথিত আছে। যে সব জায়গায় লালমাটি আছে সেই সব জায়গায় চাষ আবাদ অত্যন্ত কষ্টকর।

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রটির মধ্যভাগ কিছুটা পাহাড় টিলা, বন জঙ্গল সমাকীর্ণ। বাকি অংশ কম-বেশি সমতল। ভূস্তরে মাটির ভাগ ক্রমবর্ধমান। চাষবাস ক্রমপ্রসারণশীল। আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত পূর্বদিক অর্থনৈতিক দিক থেকে জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। পাথুরে বন্ধুর ভূস্তরের এখানে অবসান ঘটেছে। মাটি উর্বর, কিছুটা কাঁকর, 'ঘুটিং' মেশানো ধূসর। ক্রমশ এই অঞ্চল গাঙ্গেয় সমতলে মিশেছে। এই অঞ্চলে পুরনো পলি অর্থাৎ ভাঙ্গার (Bhangar) এবং নতুন পলি বা খাদার (Khadar) -এর অবক্ষেপ রয়েছে। জমি সাধারণ ভাবে চাষ আবাদযোগ্য। রয়েছে প্রচুর দিঘি-পুকুর-খাল-বিল-নদী। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান।

মানব সভ্যতায় নদীর অবদান অতুলনীয়। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির অন্যান্য অঞ্চলের মতো আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রেও প্রবাহিত নদনদী সমূহের অকৃপণ দানে এ অঞ্চল নানাভাবে সমৃদ্ধ। ভূমিরূপের ঢাল ধরে বৃষ্টির জল এবং ভৌম জল স্তরের জোগানকে সম্বল করে এই জেলার পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে বাহিত হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রধান নদী-নদী। জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নদী বা স্থানীয় আদিবাসীদের মুখে মোর নদী। এমনকি O'Malley তাঁর বীরভূম গেজেটিয়ারে একে 'MOR' বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৭] এই নদীটি ঝাড়খণ্ডের ত্রিকূট পাহাড়ের মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করে আমজোড়া গ্রামের কাছে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে। দেওঘরের সামান্য পূর্বদিকে ত্রিকূট পাহাড় অবস্থিত। বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর দৈর্ঘ্য ৫০ কিমি। ময়ূরাক্ষী নদীই বীরভূম জেলাকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। এই ময়ূরাক্ষী বা মোর নদীর তীরেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের লড়াই হয়েছিল। ময়ূরাক্ষীর পাড়ে দিঘুলি গ্রামের সেই মাঠটি এখনও "সাঁওতাল কাটার মাঠ" নামে খ্যাত। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর 'মিহিরলাল সেতু' তিলপাড়া জলাধার তৈরি হয়েছে। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রভৃতি লেখকদের রচনায় ময়ূরাক্ষী এসেছে ফিরে ফিরে। উপনদী 'মণিকর্ণিকা' (স্থানীয় ভাষায় 'কাঁদর') বিভিন্ন পথ ঘুরে ময়ূরাক্ষীতে এসে মিশেছে। এই মণিকর্ণিকার কূলেই বীরভূমের প্রাচীন প্রত্নকেন্দ্র রাঢ়কেন্দ্র বা রাঢ়কেঁদ। তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের কমলিনীর কুঞ্জটিও ছিল ময়ূরেশ্বর থানার বেলেড়া গ্রামে এবং তাও এই 'মণিকর্ণিকার' বাঁকেই। বীরভূমের জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে ময়ূরাক্ষী।

ময়ূরাক্ষীর দুটি কূলেই বীরভূম। সুখে-দুখে ময়ূরাক্ষী বীরভূমের মানুষের অংশভাগী। সুদূর অতীতকাল থেকে এই নদীর সঙ্গে মানুষের জীবিকা ও সভ্যতার নিবিড় সম্পর্ক আছে তার প্রমাণ এই নদীর তীরে অবস্থিত কোটাশুর থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ব সামগ্রী।[২৮]

ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরে দ্বারকা নদী, ঝাড়খণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে এই নদী মুরালপুরের কাছে বীরভূমে ঢুকেছে। এই নদীর তীরে অবস্থিত অন্যতম তীর্থক্ষেত্র তারাপীঠ এবং পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় গ্রাম মাড়গ্রাম। দ্বারকা থেকে প্রায় তিরিশ কিমি দূরে ব্রাহ্মণী নদী। এটি ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার দুধুয়া পাহাড়ে উৎপত্তি হয়ে ছোটনাগপুর মালভূমি পেরিয়ে নারায়ণপুরে এসে বীরভূমে ঢুকেছে। নারায়ণপুরের বেনেরা একসময় এই নদী পথেই ঢাকাই মসলিন আর সিল্কের বাণিজ্য করত। ইংরেজদের নীলকুঠি আর দুর্গাপুর তৈরি হবার আগে আকরিক লোহা গলানোর কামারশালা ছিল এই নদীর তীরে, নারায়ণপুরে।

এছাড়া বাঁশলৈ এবং পাগলা নদী ও আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান। তাছাড়া, ছোট নালা বা উপনদী — যাদেরকে স্থানীয় ভাষায় 'কাঁদর' বা 'কাঁতার' বলে সেগুলিও বেশ কয়টি বিদ্যমান। তাদের মধ্যে পলাশী, গম্ভীরা, চিল্লা, গোনা, বন্দর, কালীদহ, ঘুটিংয়া, যমুনা উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বীরভূম জেলার সমস্ত নদী-কাঁদর সবই বর্ষার জলে পুষ্ট। একমাত্র বর্ষা ছাড়া সারাবছরই হেঁটে পারাপারের যোগ্য; তাতে হাঁটুজলও থাকে না।

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলা কর্কটক্রান্তি অক্ষাংশের সংলগ্ন হওয়ায় জলবায়ু উপ-ক্রান্তীয় জলবায়ুর মতো। গরমকালে তীব্র গরম। গ্রীষ্মের দাবদাহে চারিদিক ঝলসে যায়। মার্চ মাসের শেষ থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা থাকে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গ্রীষ্মের দাবদাহ এখানে 'ঝলাস' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রাম। জুনের শেষ থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত বর্ষা বিদ্যমান থাকে। সারা বছরের মোট গড় বৃষ্টিপাত ১৪০০ মিলিমিটারের ৭৮ শতাংশই হয় এই সময়ে।[২৯] এই অঞ্চলে শীতের প্রকোপও তীব্র। ২০০৪ এবং ২০০৬ সালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ২০০৫ সালে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।[৩০] এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে L.S.S. O'Malley অনেক আগেই বলেছেন - "The Cliamate of the district is generally dry, mild and healthy."[৩১] নিয়ম মাফিক বাতাস, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে, শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলার জনসংখ্যা ঃ

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রামপুরহাট মহকুমার লোকসংখ্যা ১২, ৬৯, ৭০২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিমিতে ৮০৭ জন। রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি ব্লকে এবং পৌরসভায় যে পরিমাণ জনসংখ্যা ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ছিল তা নিম্নরূপ —

নলহাটি ১নং	—	২,০৮,৬৪২ জন।
নলহাটি ২নং	—	১,০৭,৬৫৮ জন।
মুরারই ১নং	—	১,৫৪,৩৪২ জন।
মুরারই ২নং	—	১,৭৭,৭৪৮ জন।
ময়ূরেশ্বর ১নং	—	১,৩৯,৭৩৩ জন।
ময়ূরেশ্বর ২নং	—	১,১৩,০৩১ জন।
রামপুরহাট ১নং	—	১,৫৯,১৯৩ জন।
রামপুরহাট ২নং	—	১,৫৮,৭৪২ জন।
রামপুরহাট (পৌরসভা)	—	৫০,৬১৩ জন।
নলহাটি (পৌরসভা)	—	৩৪,০৩৮ জন।

এছাড়া আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত সিউড়ি সদর মহকুমার অধীন মহম্মদবাজার ব্লকের মোট জনসংখ্যা ১,৩৯,৪৬৫ জন এবং সাঁইথিয়া ব্লকের অধীন দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট জনসংখ্যা ১৭,৮৫৭।[৩২] আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে বসবাসকারী মোট জনগণের সংখ্যা ১৪,৬১০৬২। আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে বসবাসকারী মোট জনগণের ৫.৯৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে আর গ্রামে বসবাস করে ৯৪.০৭ শতাংশ মানুষ।

আমাদের আলোচ্য অংশে বসবাসকারী কয়েকটি জাতি ও জনজাতি সম্পর্কে আলোচনা ঃ

ঢেকারু ঃ

মহম্মদবাজার, রসপুর, বৈদ্যনাথপুর ডেউচা, ডামরা, গনপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতির দেখা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিহার এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং বীরভূমে লোহা নিষ্কাশনের কাজে আসে। পরবর্তীকালে মহম্মদবাজার ইত্যাদি স্থানে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে ঢেকারুরা জীবিকাহীন হয়ে পড়ে। এদের অনেকেই দস্যুবৃত্তি শুরু করে। এরা খুব বলিষ্ঠ হয়। গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। মেয়েদের দেহের গঠন সুঠাম মজবুত। এদের টোটেম ভেড়া। সেজন্য এরা ভেড়ার মাংস খায় না। 'স্যাঙা' অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহ দেবার প্রচলন আছে। এদের বিবাহকালীন আচার অনুষ্ঠান বড়ই বিচিত্র। উপাস্য দেবী মনসা। তবে মনসা পূজায় মূর্তি থাকে না। নিরাকার মনসার পূজা হয়। এরা অনেকটা সাঁওতাল কোল-ভিল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনেরই সমগ্রোত্রীয়। আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। পরের জমিতে মজুর খেটে কিংবা ভাগচাষ করে কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটায়।

বাগদি ঃ

বাগদি সম্প্রদায় বীরভূমের প্রাচীন জনজাতি। বাগদিরা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশের সম্ভাব্য

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেছেন।[৩৩] পূর্বে এদের তেঁতুলে, ডুলে, কুসমেটো, এবং মাহান্তো — এই চারটি শ্রেণি বা 'থাক' ছিল। বর্তমানে সেরকম কড়াকড়ি কোনো শ্রেণি বিভাজন নেই। এদের প্রধান বৃত্তি মাছ ধরা। এছাড়া এরা চৌকিদারির কাজ করে, পালকি বহন করে, চাষ করে, এমনকি মজুর খাটে। বিবাহের বিচিত্র রীতি লক্ষ করা যায়। বর যায় কন্যার বাড়ি বিয়ে করতে। বাড়ির উঠোনে পৌঁছলে কন্যাপক্ষের সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। বরপক্ষই সব সময় যুদ্ধে জয় লাভ করবে এটাই রীতি। তারপর নানা আচার অনুষ্ঠানের পরে বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। এরা খুব কর্মঠ হয়। গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ, মাথা তুলনায় মোটা। বর্তমানে হিন্দু দেবদেবী—দুর্গা, কালী, শিব, নানা রকমের ষষ্ঠী পূজায় এরা অভ্যস্ত হচ্ছে। ধর্মরাজের পূজায় 'ভক্ত্যা' হয়।

মাল ঃ

এদের ছয়টি শ্রেণি বা 'থাক' বিদ্যমান। সেগুলি হল ছত্রধারী, রাজবংশী, মল্লিক, পাহাড়ি, কোল, এবং কাদর। অন্য শ্রেণির সঙ্গে এদের বিবাহ নিষিদ্ধ। মাছ ধরে, চাষ বাস করে, অন্যের জমিতে মজুর খেটে, চৌকিদারি করে, জীবিকা নির্বাহ করে। এদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। প্রেত পূজায় মুরগি-বলির চল আছে। মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দেয়। হিন্দু দেবদেবী বর্তমানে এদের উপাস্য। ইদানিং সমাজে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

কৈবর্ত বা ক্যাওট ঃ

ময়ূরেশ্বর থানার বিভিন্ন গ্রামে এদের দেখা পাওয়া যায়। এদের উপাধি 'ধীবর', ' গোঁড়' ইত্যাদি। মূল পেশা মাছ ধরা ও বিক্রি করা। বর্তমানে এরা চাষের কাজেও যুক্ত। পূর্বে বাল্যবিবাহ এদের সমাজে বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে কিশোর কিশোরীদের বিয়ে দেবার চল আছে। পচুই মদ খাওয়া এদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। উৎসব অনুষ্ঠানে মদ অপরিহার্য।

খয়রা ঃ

সাঁইথিয়া ব্লকের দেরিয়াপুর, পুনুর, দইকোটা, প্রভৃতি গ্রামে এবং মহম্মদবাজার ব্লকের অন্তগর্ত বেশ কিছু গ্রামে এদের দেখা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় বর্তমান। একটি খয়রা অন্যটি রাইখয়রা। এরা পূর্বে বিহারের বাসিন্দা ছিল। রাইখয়রা সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ উৎসব দেখা যায়। সেটি হল আখ্যান পূজা বা ভুত পূজা। পয়লা মাঘ ছোট বড়ো নির্বিশেষে এই উৎসবটিতে অংশগ্রহণ করে। নিজেরাই মোরগ, পাঁঠা, মদ, ফল ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে ভুতের থানে উপস্থিত হয়। তারপর বয়স্ক কোন ব্যক্তি সন্তান, পরিবার, গ্রামের সকলের সুখ কামনা করে মোরগ, পাঁঠা বলি দেন। তারপর সকলেই সেই প্রসাদ গ্রহণ করে মদ পানের মধ্যে দিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে আসে।

খয়রাদের মধ্যে বিবাহকালীন বিশেষ আচার পরিলক্ষিত হয়। বর সহ সাতজন উপোসি বিয়ের আগের সাতদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। বিয়ে হয় কেবলমাত্র রবিবার। বিয়ের দিন ভোর

থেকে ব্রাহ্মণ, নাপিত প্রভৃতিরা পূজা শুরু করে। পাঁঠা বলিদান হয়। তারপর রান্না ও অন্যান্য সামগ্রী খাওয়া-দাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তিন হাত চওড়া, তিন হাত লম্বা, তিন হাত গভীর, কেটে রাখা গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। দুপুরের রান্না এবং পূজার সামগ্রী বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় না। এঁটোকাঁটা, পাতা, ভুক্তাবশেষ সবই মাটির গর্তে ফেলে দেওয়ার পর সন্ধ্যায় বর বিয়ে করতে যায়। আগে কন্যাপণের রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে বরপণ নেওয়া হয়।

সদ্‌গোপ ঃ

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলার একটা বড় অংশে সদগোপদের বাস এদের সম্পর্কে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার ভিত্তিতে অতুল সুর বলেছেন "সদগোপদের মোট সংখ্যার ৮৭ শতাংশ বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও হুগলী হাওড়ার বাসিন্দা ছিল। তাদের আদি বাসস্থান ছিল গোপভূমে বা বর্ধমান-বীরভূম জেলায়। সেখানে থেকেই তারা অন্যত্র গমন করেছে।"[৩৪] কৃষিকার্যই এদের প্রধান জীবিকা। বেশিরভাগ জমির মালিক এরা। বর্তমানে এদের উপাধি মণ্ডল, ঘোষ, রায়, রায়চৌধুরী ইত্যাদি।

ভল্ল/ভল্লা ঃ

ময়ূরেশ্বর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের দেখা যায়। পূর্বে সামন্ত রাজাদের অধীনে সৈন্য-সামন্তের কাজ করত। পরবর্তীকালে জমিদারদের 'লাঠিয়াল' ছিল। এরা স্বভাবে উগ্র, গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। বর্তমানে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, মজুর খাটে। এরা মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত।

লেট ঃ

রামপুরহাট মহকুমার বহু গ্রামেই এদের বাস। গায়ের রঙ কালো। স্বভাবে কিছুটা উগ্র এবং জেদি। পূর্বে দস্যুবৃত্তি করত। বর্তমানে দিনমজুরি খাটে। এছাড়া জাল বোনা, মাছ ধরা এদের বৃত্তি। বিশেষ করে গোলাকার জালি দিয়ে ছোট মাছ ধরতে এরা বিশেষ পারদর্শী। মনসা, ধর্মের আরাধনা ছাড়াও হিন্দু দেবদেবীরাও এদের উপাস্য। 'প্যাট ভরলে ল্যাট রাজা' — এরা যে অল্পেই সন্তুষ্ট, স্থানীয় প্রবাদটিতে তা ধরা পড়েছে।

ধাঙ্গড় ঃ

এদের আদি নিবাস বিহার, ঝাড়খণ্ড। কেউ কেউ মনে করেন পূর্বে এরা ওরাওঁ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত কিছু গ্রামে এদের দেখা পাওয়া যায়। ইঁদুর এই জাতির প্রিয় খাদ্য। মদ খাওয়ায় এরা বিশেষ পারদর্শী। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় প্রচুর মদ্যপান করে। মাটি কাটা এদের মূল পেশা। অন্যের জমিতে চাষবাসও করে। মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কর্মঠ। বিবাহে কন্যাপণের রেওয়াজ আছে। বিয়ের সময় বর গাছের উপর চড়ে বসে। কনে নিচে থেকে বরকে আহ্বান জানায় নেমে আসার জন্য —

গাছ থেকে নাম তুমি
মাটি কেটে খাওয়াব আমি।

এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা বর্তমান, তবে বাংলা ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। বয়োবৃদ্ধরা কুড়ি-র বেশি গুনতে পারে না। তবে বেশি গুনতে হলে 'এক কুড়ি এক', 'এক কুড়ি দুই' এইভাবে গুনে থাকে।

ডোম ঃ

এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত। এদের আগে চারটি শ্রেণি থাকলেও বর্তমানে শাজুনে আর বাজুনেদেরই প্রাধান্য। শাজুনেরা ঝুড়ি, 'পেছ্যা', 'টোকা', ডালি, পাখা (স্থানীয় কথ্যে 'ব্যানা'), 'খাঁচি', 'চিক', জাফরি, বড় ঝুড়ি ('ঢাকি'), চালুন, কুলো, ছোটো হাতঝুড়ি ('টুকি') ইত্যাদি বাঁশ ও কঞ্চি থেকে তৈরি করে। বাজুনেরা ঢোল, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাজায়। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। নিম্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। ধর্মরাজের পূজায় বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। স্বভাবে সহজ সরল, দৈনন্দিন জীবন যাপন সাদামাটা। বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে 'ডোম' বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত। ১০ নং চর্যায় কাহ্নপাদ লিখেছেন —

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআ।।"

(অতীন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক, চর্যাপদ, পৃ. ১৩০)

—নগরের বাইরে ডোম্বির কুঁড়ে ঘর। কামান্ধ নেড়া ব্রাহ্মণ সেই নৃত্যগীত পাটিয়সী অস্পৃশ্য নারীর কুঁড়েঘরের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে। দিনের বেলায় ডোমনিকে ছুলে ব্রাহ্মণের জাত যায়। রাতে তার সঙ্গে থাকলে দোষ থাকে না। তপশিল জাতির ডোমেদের অবস্থা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত একই। তাদের বাস গ্রামের বাইরে, পুকুর পাড়ে।

ডোমেরা একসময় বীরের জাতি, যোদ্ধার জাতি ছিল। তার প্রমাণ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে ডোম জাতির বিজয় গৌরবের কথা আছে। একসময় বীরভূমের জমিদারদের অনেক লাঠিয়াল ছিল ডোমেরাই। বীরভূমের জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় মূলত ডোমেদেরকে নিয়েই 'ব্রতচারী বাহিনী' গড়েছিলেন। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর, সোঁজ, টেকেড্ডা, রামনগর, ষাটপলশা প্রভৃতি গ্রামের ডোমেরাই পূর্ব পুরুষদের 'রায়বেঁশের' (স্থানীয় ভাষায় 'আইবেশ্যা') মশালকে টিম টিম করে আজও বয়ে নিয়ে চলেছে।

হাড়ি ঃ

এই সম্প্রদায়ের চারটি শ্রেণি বা থোক দেখা যায়। সেগুলি হল ভুঁইমালী, দাই বা ফুলহাড়ি, কাহার এবং মেথর। তবে এখানকার হাড়িরা ময়লা পরিষ্কার করে না। এদের গায়ের রঙ বাদামি। আগে এই জাতির মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে এই প্রথা অবলুপ্ত হয়েছে। তবে

কিশোর কিশোরীদের বিয়ে দেবার রেওয়াজ আছে। এই জাতি মদ্যপানে পটু।

বাউরি ঃ

এরাও এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী। এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দেহ মধ্যমাকৃতির। হিন্দুদের অনেক আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেন। মূল পেশা ঘরামি। একটি প্রবাদে আছে —

এল ডাউরি
মোলো বাউরি।

অর্থাৎ অতি বৃষ্টি বা ডাউরিতে ঘরের চাল ছাওয়ার কাজ হবে না তাই তারাও কোনো কাজ না পেয়ে মারা যাবে। প্রবাদটিতে এই জাতির পেশার ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

মুচি ঃ

এরা কালী ও দুর্গার উপাসক। পূর্বে গোরুর মাংস ভক্ষণ করলেও বর্তমানে দূরে থাকে। এদের মূল পেশা ঢাক বাজানো। একটি প্রবাদে আছে — 'মুচি, ঢাক বাজিঙে পায় না লুচি'। এছাড়া এরা জুতো সেলাই ও তৈরি এবং চাষবাস, দিন মুজরি করে দিন গুজরান করে।

কামার ঃ

মূলতঃ লোহার কাজ করে। খুব কর্মঠ এবং পরিশ্রমী হয়। দেহ সুগঠিত এবং মজবুত। বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান বর্তমানে হিন্দুদের মতোই পালন করে।

ঘাটোয়াল ঃ

এই সম্প্রদায়টি যাযাবর সাঁওতালদের মতোই বন, পাহাড় ও বৃক্ষপ্রেমিক। বীরভূমে মুসলমান শাসন কালে এদের কাজ ছিল ঘাট পাহারা দেওয়া। পরবর্তীকালে ইংরেজদের কাছে এরা 'ডাকাত' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এদের প্রসঙ্গে হান্টার সাহেব লিখেছেন — মুসলিম সৈন্য বাহিনীর আবর্জনা স্বরূপ কর্মচ্যুত সৈন্যদের (ঘাটোয়াল) ভ্রাম্যমান দলগুলিই ডাকাতি করে বেড়াত। বর্তমানে তারা জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসছে। এখন এইসব গরীব মানুষগুলোর মূল বৃত্তি দিন মজুরি।

পটুয়া ঃ

বীরভূমের নলহাটি থানার সরধা, মাড়গ্রাম থানার বিষ্ণুপুর, চাঁদপাড়া, সাহাপুর, ময়ূরেশ্বর থানার ষাটপলশা, শিবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বেশ কিছু পটুয়ার বাস। স্থানীয়ভাবে এরা 'বেদ্যা' নামে অভিহিত। বর্তমানে এরা উপজাতি হিসেবে গণ্য হয়েছে। এদের সমাজে হিন্দু মতে বিয়ে এবং মুসলমান মতে কবর দেওয়া হয়। সদ্য প্রয়াত ষাটপলশার বাঁকু পটুয়া পটশিল্পের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন।

সাঁওতাল ঃ

এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ আদিবাসী সম্প্রদায় হল সাঁওতাল। বন-জঙ্গলের আশেপাশে এদের অনেক বসতি। অরণ্যের অধিকার ফিরে পাবার জন্য সাঁওতালরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাদের সেই অধিকার হালে অনেকটাই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রাচীন সুসংবদ্ধ ঐতিহ্যপূর্ণ জাতির ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ছন্দময়। বহু পরিবর্তনের মাঝেও জীবন ও সংস্কৃতিকে এরা অনেকটাই ধরে রেখেছে। এদের নৃত্য, গীত, দেওয়ালচিত্র, শিল্প, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নৈসর্গিক আনন্দের পরিচয় বহন করে। পূর্বে পশু শিকার, বনজসম্পদ আহরণ করে এরা জীবিকা নির্বাহ করত। এখন বনজঙ্গল কেটে বসতি হওয়ায় এই জীবিকা অবলুপ্তির মুখে। এখন এদের অনেকেই চাষবাস করে, কেউ কেউ অন্যের জমিতে মজুর বা 'মুনিষ' খেটে, কেউ বা পশুপালন করে এবং অনেকে পাথর খাদানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সাঁওতাল পুরষদেরকে 'মাঝি' এবং মহিলাদের 'মেঝ্যান' বলে। হিন্দুদের চেয়ে সাঁওতালদের আচার অনুষ্ঠান বেশি বলে মনে করেন হান্টার সাহেব।[৩৫] নানাধরনের অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে তারা 'জানগুরু' কে দিয়ে নানারকম পূজার্চনা করে। ডাইনি বা 'ডাইন' প্রথার প্রভাব সমাজে প্রচলিত। এদের প্রধান দেবতা মারাংবুরু। সোহরাই, বাদনা প্রভৃতি এদের প্রধান উৎসব । 'কাঁচি' আর 'পাকি' মদের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের তালে তালে সারা রাত সাঁওতাল পুরুষ-রমণীরা মাথায় পালক গুঁজে, রঙিন পোষাক পরে নাচে গানে মত্ত হয়ে ওঠে। তাতে আদিম জীবনের প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে চারিদিক ভরে ওঠে। নানা ধরনের পূজায় শূকর, সাদা ছাগল, পায়রা বলিদানের রীতি এদের সমাজে আজও বর্তমান। এরা দক্ষ শিকারি হয়। শিকারে তির ধনুকই এদের প্রধান অস্ত্র। মাটি কাটায় এরা বিশেষ দক্ষ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং অপুষ্টি এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বিয়েতে কন্যাপণ নেওয়ার রেওয়াজ আছে। ছেলে মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে হয়। নানা সমস্যার মধ্যে কেউ কেউ চাকরি বাকরি পেয়ে সমাজকে সচেতন করার চেষ্টায় রত। তবে সিনেমা, টিভি, ভিডিও প্রভৃতির কুরুচিকর প্রদর্শন এবং তাকে নকল করার অন্ধ অনুকরণ এই সম্প্রদায়ের নিজস্বতাকে আস্তে আস্তে কেড়ে নিচ্ছে।

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে বসবাসকারী প্রধান প্রধান জাতি বা গোষ্ঠী এবং আদিবাসী জন গোষ্ঠীর একটি তালিকা তুলে ধরা হল।

ব্রাহ্মণ	চামার	তাঁতি	পাটনি
কায়স্থ	ডোম	গন্ধবণিক	ময়রা
গোয়ালা	শুঁড়ি	বারুই	শাঁখারি
তিলি	তিয়র	কামার	সূত্রধর
বাউরি	মেথর	কুমোর	ধোপা
সদগোপ	কলু	বৈরাগী	বাইতি
নাপিত	কাহার	বাগদি	ভল্ল
হাড়ি	কৈবর্ত	চণ্ডাল	রাজবংশী

মুচি	সুবর্ণবণিক	ধীবর	কেওট
স্বর্ণকার	সাঁওতাল	কোড়া	মালপাহাড়িয়া
ঘাটোয়াল	হো	ওরাওঁ	ধাঙ্গড়
মুন্ডা	বেদে	কোনাই	বায়েন
পটুয়া	লেট	ঢেকারু	দাই
মাল	খয়রা		

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রামপুরহাট মহকুমায় তপশিলি জাতিভুক্ত পুরুষের সংখ্যা ১,৮৫,১৩০ জন এবং তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলার সংখ্যা ১,৭৪,৬০৯ জন। এই মহকুমায় তপশিলি উপজাতিভুক্ত ২৮,৫৪৮ জন পুরুষ এবং ২৮,৪৪৭ জন মহিলা বসবাস করে। এছাড়া সিউড়ি সদর মহকুমার অন্তর্গত মহম্মদবাজার ব্লকে তপশিলি জাতিভুক্ত পুরুষের সংখ্যা ৩৭,৩৬৮ জন এবং তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলার সংখ্যা ১৮,১৮৯ জন। এই ব্লকে তপশিলি উপজাতিভুক্ত পুরুষের সংখ্যা ১৩,৩৮০ জন এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলার সংখ্যা ১৩,৪২০ জন।

শিক্ষা ঃ

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র খুব আশাপ্রদ নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নতি, অর্থনৈতিক ভাবে কৃষিনির্ভর হওয়া, স্কুল-কলেজের অপ্রতুলতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে এতদঞ্চল পূর্ণসাক্ষর নয়। সমগ্র রামপুরহাট মহকুমায় গ্রামে বসবাসকারী পুরুষদের মধ্যে ৬৮.১৯ শতাংশ পুরুষ সাক্ষর এবং মহিলাদের মধ্যে ৪৮.৯২ শতাংশ মহিলা সাক্ষর। অন্যদিকে শহরে সাক্ষরতার চালচিত্রটি একটু আশাব্যঞ্জক। সেখানে পুরুষদের মধ্যে ৮৮.১৮ শতাংশ পুরুষ সাক্ষর এবং মহিলাদের মধ্যে ৭৪.০৪ শতাংশ মহিলা সাক্ষর। ব্লকভিত্তিক পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে মুরারই ১নং ব্লকে সাক্ষরতার গড় হার ৪৬.৬ শতাংশ; মুরারই ২নং ব্লকে ৪৬.২ শতাংশ; নলহাটি ১নং ব্লকে ৬৩.৭ শতাংশ; নলহাটি ২নং ব্লকে ৬১.৬ শতাংশ; রামপুরহাট ১নং ব্লকে ৬১.৯ শতাংশ; রামপুরহাট ২নং ব্লকে ৬৩.৫ শতাংশ; ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লকে ৬৫.৪ শতাংশ; ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকে ৬২.৮ শতাংশ এবং মহম্মদবাজার (সিউড়ি মহকুমা) ব্লকে সাক্ষরতার হার ৫৫.১ শতাংশ। উপরে বিভিন্ন ব্লকে সাক্ষরতার চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাক্ষরতার দিক থেকে মুরারই ১নং এবং মুরারই ২নং ব্লক সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপরে বর্ণিত ব্লকগুলির একটা বড় অংশের জনগণ শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে আছে। এদের জন্য সামগ্রিক ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন, নইলে এরা সমাজ থেকে আরো পিছিয়ে পড়বে।

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমায় ৮৪৩ টি প্রাথমিক স্কুল, ২৬ টি মিড্‌ল স্কুল, ৯৩ টি হাইস্কুল, ৩৫ টি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ৬ টি এবং ১ টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বর্তমান। এছাড়া মহম্মদবাজার ব্লকে ১২৩ টি প্রাইমারী স্কুল, ২ টি মিড্‌ল স্কুল, ১১ টি হাইস্কুল, ৬ টি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং ১ টি সরকারি

সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

ধর্ম ও পালাপার্বণ ঃ

নানাধর্মের মহামিলনক্ষেত্র, আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলা। এইসব অঞ্চলে যেসব ধর্মের লোক বাস করে তার একটি পরিসংখ্যান ১৯৯১ সালের জনগণনা হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিচে তুলে ধরলাম।

নলহাটি ১নং ঃ

এই ব্লকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ৮৩,১২৮ জন, মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ৯০,৩৪৪ জন, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ৯৮২ জন, জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ৭ জন এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৮০ জন।

নলহাটি ২নং ঃ

এই ব্লকে হিন্দু ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৩৬,৬১৯ জন, মুসলিম ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৫৮,১৭৮ জন, খ্রিস্টান ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৫০ জন, জৈন ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৩ জন, বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৫ জন এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সংখ্যা ৪১ জন।

মুরারই ১নং ঃ

এই ব্লকে হিন্দু ধর্মের ৪৩,৯৪২ জন, মুসলিম ধর্মের ৭৮,৪৯৮ জন, খ্রিস্টান ধর্মের ৫৫ জন, শিখ ধর্মের ১৪ জন, জৈন ধর্মের ৩০ জন এবং বৌদ্ধ ধর্মের ৫ জন মানুষ বসবাস করেন।

মুরারই ২নং ঃ

এই ব্লকে হিন্দুধর্মের ৫১,৯৬১ জন, মুসলমান ধর্মের ৯২,৮২৩ জন, খ্রিস্টান ধর্মের ৬৫ জন, শিখ ধর্মের ১৭জন, বৌদ্ধ ধর্মের ৩ জন, জৈন ধর্মের ৩৫ জন এবং অন্যান্য ধর্মের ৪ জন মানুষ বাস করেন।

ময়ূররেশ্বর ১নং ঃ

এই ব্লকে হিন্দু ধর্মের ৮৮,৪৪০ জন, মুসলিম ধর্মের ২৮,০০২ জন, খ্রিস্টান ধর্মের ১০০ জন, বৌদ্ধধর্মের ২ জন, জৈন ধর্মের ৪৮ জন লোক বাস করেন।

ময়ূরেশ্বর ২নং ঃ

এই ব্লকে হিন্দুধর্মের ৭৪৯৫৯ জন, ২৩,৭৩৩ জন মুসলিম ধর্মের, ৮৪ জন খ্রিস্টান ধর্মের, ৪০ জন জৈন ধর্মের, ২ জন বৌদ্ধ ধর্মের লোক বাস করেন।

[redacted]
234970
14 AUG 2011
N.B.U. LIBRARY

রামপুরহাট ১নং ঃ

এই ব্লকে ৮৪,৬২৪ জন হিন্দু, ৪৯,১১০ জন মুসলিম, ৫৫৭ জন খ্রিস্টান, ২১ জন জৈন এবং অন্যান্য ধর্মের ১৭ জন লোক বসবাস করেন।

রামপুরহাট ২ নং ঃ

এই ব্লকে ৮৭,২৪২ জন হিন্দু, ৫০,৭২০ জন মুসলিম, ৪৮৭ জন খ্রিস্টান, ১৯ জন জৈন এবং অন্যান্য ধর্মের ১৭ জন লোক বাস করে।

মহম্মদবাজার ব্লকে হিন্দু ধর্মের ৮৫,০৮২ জন, মুসলিম ধর্মের ৩০,৮৪০ জন, খ্রিস্টান ধর্মের ৩৩৪ জন, শিখ ধর্মের ৩৪ জন, বৌদ্ধ ধর্মের ২ জন, জৈন ধর্মের ৯ জন এবং অন্যান্য ধর্মের ১৮ জন লোক বাস করে।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের পরেই মুসলিমধর্মের লোকজনের বাস। এই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে নানাধরনের পার্বণ বা পরব পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে ঈদ্-উদ্-জোহা, ঈদ্-উল্-ফেতর, সব্-এ-বরাত, মহরম প্রভৃতি প্রধান। এদের কাছে জুম্মাবার বা শুক্রবার পবিত্র দিন হিসেবে পরিগণিত। রমজান মাস পবিত্র মাস।

আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের লোকেরা গোটা বছর জুড়ে নানা ধরনের উৎসব পালন ও পূজার্চনা করে। তার মধ্যে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রধান। নানা ধরনের ষষ্ঠীর আরাধনা এখানকার লোকেরা গোটা বছর জুড়েই করে। তার মধ্যে গাছ ষষ্ঠী, গাড়া বা গ্রন্থন ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, লোটন বা লুন্ঠন ষষ্ঠী, শীতলা ষষ্ঠী, নীল ষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠী প্রভৃতি উল্লেখ্য। বাংলা মাসের শেষ দিনে যে সংক্রান্তি আসে সেই সব সংক্রান্তিতে প্রায় গোটা বছর জুড়েই নানা ধরনের কৃত্যানুষ্ঠান বা Rituals পালন করা হয়। এগুলির মধ্যে আষাঢ়ে সংক্রান্তি বা 'তেঁতরমেতর সংক্রান্তি', আশ্বিন মাসে 'ডাক সংক্রান্তি', কার্তিক মাসে 'মুঠিকাটা সংক্রান্তি', অঘ্রান মাসে 'ইতু সংক্রান্তি', পৌষ মাসে 'পৌষ সংক্রান্তি', চৈত্র মাসে 'চৈত্র সংক্রান্তি' বা 'চোতপরব' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আষাঢ়ে সংক্রান্তি বা 'তেঁতরমেতরের' দিনে ঘুম থেকে উঠে সকলেই স্নান করে খালি পেটে কয়েকটা মসুর ডাল, কাঁচা রসুন, কাঁকরোল জাতীয় ফলের (স্থানীয় ভাষায় 'কেল্যা কাঁকড়া') টুকরো চিবিয়ে খাওয়ার পরে অন্য কিছু খায়। ওই দিন নিরামিষ খাওয়ার প্রচলন আছে। বাড়ির চারপাশের দেওয়ালে গোবরজল দিয়ে 'বেড়ি' দেওয়ার প্রথা আছে। আশ্বিন মাসের ডাক সংক্রান্তিতে বাড়ির গৃহস্থ খুব ভোরে উঠে মাঠে গিয়ে তার জমির চারকোণে চারটি বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিয়ে বলে ওঠেন — লোকের জমি আলথাল/আমার জমিতে শুধুই চাল। কার্তিক মাসের শেষদিনে মুঠিকাটা সংক্রান্তি। ওইদিন বাড়ির বয়স্ক কোনো ব্যক্তি উপবাসে থেকে স্নান করে ধুতি পরে কাস্তে নিয়ে মাঠে যায়। সঙ্গে থাকে উত্তরীয়। তারপর মাঠে গিয়ে নিজের জমির উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে এক মুষ্টি পরিমাণ ধান কাস্তে দিয়ে একটানে কেটে হলুদ উত্তরীয় জড়িয়ে ঘরে নিয়ে আসে। গোটা রাস্তা সে নির্বাক থাকে। ঘরে ঢোকার মুখে বাড়ির কোনো বয়স্কা জলের ধারা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার পরে সেটি সিংহাসনে রেখে পুরোহিত দ্বারা

পূজা করা হয়। অঘ্রান মাসের শেষ দিনে ইতুসংক্রান্তিতে ইতু পূজা করে তার মহা সমারোহে ঘট বিসর্জন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ আগলানো অর্থাৎ গোটা রাত জেগে ধনের দেবী লক্ষ্মীকে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেঁধে রাখার একটা প্রয়াস দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তি বা চোত পরবে কোথাও শিবের গাজন কোথাও বা ধর্মরাজের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গা পূজা, কালীপূজা বা সরস্বতী পূজাকে বাদ দিলে ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলায় বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব হল নবান্ন,[৩৬] যা স্থানীয়ভাবে 'লবান' নামে উচ্চারিত হয়। বেশিরভাগ গ্রামেই গ্রামবৃদ্ধও অন্যান্যরা মণ্ডপে বসে অঘ্রান মাসের কোন্‌দিন্ নবান্ন পালিত হবে তা ঠিক করে। তারপর সেই দিনটিকে ঘিরে কি উৎসাহ উদ্দীপনা! মূলত নতুন 'লঘু' বা 'রামশাল' ধানের চাল থেকে পায়েস এবং চাল গুড়ো থেকে 'গুলুনি' বা 'মলিদ্যা' তৈরি করে বাস্তুদেবতা এবং দেবী অন্নপূর্ণাকে ভোগ দেওয়া হয়। অভুক্ত থেকে স্নানের পরে সেই প্রসাদ নিয়ে আত্মীয়স্বজনসহ বাড়ির সকলেই এক সঙ্গে বিশেষভাবে প্রস্তুত চালের 'গুলুনি' এবং মিষ্টান্নাদি, ফলমূল সহযোগে আহার করে। অনেক বাড়িতেই ওইদিন নানা প্রকারের মিষ্টি তৈরি করা হয়। দুপুরেও সাত প্রকারের ভাজা, নানান ব্যঞ্জন, মাছ, পরমান্ন সহযোগে ভুরিভোজ — গোটা বছরের মধ্যে এক অন্যতম দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। রাতে গান বাজনার আসর বসে। বহু গ্রামেই গ্রামের ছেলেরাই যাত্রাপালার আয়োজন করে। তাছাড়া কবি, বাউল ইত্যাদিও উৎসবের দিনগুলিকে আনন্দমুখর করে তোলে। নবান্নের রাতে বাড়ির মা ঠাকুমারা কাঁসার থালায় 'ল-পুরন' করার সময় নতুন ও পুরনো চাল একসঙ্গে মিশিয়ে বলতে থাকেন —

নতুন কাপড় পুরনো অন্ন
পরতে খেতে যায় যেন জন্ম জন্ম।

তারপর সেই মিশ্রিত চালের থালাটি পরিবারের সকলের মাথায় ছুঁইয়ে দেন। এর মধ্যে দিয়ে গৃহস্থের সাধারণভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার কামনা টুকু ধরা পড়ে।

নবান্নের পরদিন 'পান্ত লবান', সেদিন অরন্ধন, বাসি খাবার দিন। তার পরের দিন 'ত্যা-পান্ত লবান'।

এতদঞ্চলের আরো একটি বড় পার্বণ হল 'সিজ্যানো'[৩৭] অর্থাৎ সিদ্ধ খাওয়া। বসন্তের শুক্লা পঞ্চমীর দিন মা ঠাকুমারা ধৌত কাপড় পরে শুদ্ধ হয়ে মাটির বা 'সতের' (অ্যালুমিনিয়াম) বড় হাঁড়িতে পুকুরের জল দিয়ে গোটা কলাই সিদ্ধ করতে দেন। কলাইয়ের মধ্যে থাকে মাস কলাই বা কালো কলাই, বুট বা ছোলা কলাই, মটর কলাই, বরবটি কলাই এবং অড়হর কলাই। সঙ্গে দেওয়া হয় বৃন্তসহ বেগুন, শিকড় ও পাতাসহ কাঁচা রসুন, বথুয়া বা বোথো শাক। তারপর ঘুঁটে, কাঠ ও তুষের জ্বালানিতে আস্তে আস্তে দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই মিশ্রণ সিদ্ধ করা হয়। প্রচলিত লোকবিশ্বাস যতক্ষণ ওই হাঁড়ি আখা বা উনুনে বসানো থাকবে ততক্ষণ অন্যান্য আখা বা উনুন জ্বালানো যাবে, হাঁড়ি নামালে আর উনুনে কিছু করা যাবে না; করলে পরিবারের অমঙ্গল হবে।

পরদিন শীতলা ষষ্ঠীকে কলাইয়ের 'বাঁটো' বা ভোগ দেওয়ার পর সেই কলাই, মুড়ি ভাত

দিয়ে খাওয়া হয়। এই দিন অরন্ধন। শিল নোড়াকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়। পূর্ব দিনের রান্না এই দিন খাওয়া হয়। তবে মূলতঃ সারাদিনই মুড়ির সঙ্গে এই ঝোল মিশ্রিত কলাই খাওয়া হয়। বয়োবৃদ্ধদের মতে সিজ্যানোই সবচেয়ে ভালো পরব। কারণ এতে খাটনি কম, খাওয়া যায় পেট ভরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রসুন ও নানান কলাই সহযোগে যে সিদ্ধটি হয় সেটি বসন্ত রোগের প্রতিষেধকের কাজ করে।

এই অঞ্চলের আর একটি লোকপ্রিয় পার্বণ 'পালুনি'। এটিও মূলত অরন্ধন উৎসব। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম যে শনিবার আসে সেই শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত মোট তিনদিন কোনো প্রকার শাক খাওয়া বারণ। তারপর দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার শাক খাওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানকার লোকভাষায় শাক না খাওয়ার এই সময়টিকে 'শাগপালা' বলে। মঙ্গলবারের পরে ওই সপ্তাহেই যে শনিবার আসে তার আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ভাত ও অন্যান্য শাকসবজি বেশি করে রান্না করে রাখা হয়। শনিবার সেগুলি ঠাণ্ডা অবস্থাতেই খাওয়া হয়। ওইদিন উনুন জ্বালানো বারণ। এমনকি শিল নোড়াকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়। ভালো করে শিল নোড়াকে ধুয়ে তেল হলুদ মাখিয়ে কাপড় জড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়। রাতে পাড়া পড়শিদের ডেকে এনে খই, চিঁড়ে, দই, আম, মিষ্টি এবং সবশেষে ভাজা ছোলার গুঁড়ো দিয়ে মুড়ি খাওয়ানো হয়। এই উৎসবের সঙ্গে মা মনসার পালন ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম এবং উনুন, লাঙ্গল, গোরু ইত্যাদিকে একদিন বিশ্রাম দেবার পালন যুক্ত আছে বলে এর নাম 'পালুনি' — এমন কথা প্রাচীনেরা মনে করেন।

এখানকার আর একটি পার্বণ হলো 'দাউনবড়া'।[৩৮] এই অনুষ্ঠানটি সবাই একদিনে পালন করে না। 'দাউনবড়া' হলো চাষির জমির সমস্ত ধান যেদিন মাঠ থেকে ঘরে আসবে সেদিন মাঠের ঈশান কোনে এক গোছা ধানকে না কেটে রেখে দেওয়া হয়। তারপর ওই ধানগুচ্ছের গোড়ায় জল, ধূপ, সিঁদুর দিয়ে শিকড় ও মাটিসহ পাকা ধানগুলিকে একটানে উৎপাটন করা হয়। তারপর ঘরে এনে সেই ধানের গুচ্ছ বা 'দাউন'টিকে কুলের ডালের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। ধান মাড়াইয়ের শেষ দিনে ওই 'দাউন' টিকে ঝাড়ানো হয়। যেদিন 'দাউন' টিকে মাঠ থেকে ঘরে আনা হয় সেদিন পঞ্চব্যঞ্জন ও পরমান্ন সহযোগে পাড়া প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে আচার অনুষ্ঠানগুলি জীবনের বিচিত্র শিল্পসুষমায় মণ্ডিত। এগুলির অনেক উপাচার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে এইসব পালাপার্বণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বাড়ির পুরুষ এবং মেয়েরাই এইসব পূজা নিষ্পন্ন করে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এইসব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। কৃষি ও নানা ধরনের পূজাচারকে কেন্দ্র করেই এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মকর্ম জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাহেতু এবং নানা কারণে এখানকার মানুষ এখনও তাদের পুরনো অনেক ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে।

লোকসংস্কৃতি ঃ

এক আঞ্চলিক সংস্থানায়ত সংহত মানবগোষ্ঠীর মূলত মৌলিক ঐতিহ্য সম্পন্ন সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রযৌক্তিক কর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, বিশ্বাস, লোকধর্ম ও চিরন্তন উৎসব, মেলা, মিথ এবং লিজেণ্ড সংক্রান্ত পুরাকথা, লোকচিত্রকলা, লোকযানিক গ্রামীণ কারুশিল্প - দারুশিল্প - বস্ত্রশিল্প-গৃহনির্মাণশিল্প ও লোকচিকিৎসা সম্পর্কিত বিধিবিধান, লোকক্রীড়া ইত্যাদি হলো লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান।[৩৯] আর এই লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি মানুষ অথবা সমগ্র সমাজ। সার্বিক সমাজস্বীকৃত বলেই লোকসংস্কৃতির রেণুসমূহ সজীব, সচল, প্রাণবন্ত। লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপেই দেশজ। লোকসংস্কৃতি — জনগোষ্ঠী, জীবন ও সমাজের প্রাণবন্ত রূপকে তুলে ধরে। আর সেই জন্যই আমরা আঞ্চলিক ভাষার আলোচনার সূত্রেও লোকসংস্কৃতিকে যুক্ত করেছি। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের মধ্যে লোকসাহিত্য হল একটি অন্যতম উপাদান। আর এই লোকসাহিত্যের অন্তর্গত হল ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, মন্ত্র, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি।

ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলায় ব্যবহৃত কয়েকটি লোকসাহিত্যের নমুনা —

ক. ধাঁধা ঃ

"যে বাক্য দ্বারা একটিমাত্র ভাব রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হয় তাকে ধাঁধা বলে।"[৪০] ধাঁধা লোকসাহিত্যের একমাত্র বিষয়, যা যৌথভাবে উপভোগ্য। ছড়া কিংবা গানের কোনো শ্রোতা না থাকলেও গায়কের একাকী গান গেয়ে অথবা আবৃত্তি করে আনন্দ হয়, কিন্তু ধাঁধা একাকী বলা যায় না। তার একজন উত্তরদাতা থাকতেই হবে এবং সেই উত্তরদাতাকে সামনে থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। ধাঁধার রচনায় বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত থাকে। তাই ধাঁধা এবং তার উত্তর একদিকে বুদ্ধির অনুশীলন অন্যদিকে মানসিক ক্রীড়া বা Mental recreation। আমাদের নিতান্ত পরিচিত বস্তু, নিত্য ব্যবহার্য ও বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বহু জিনিস ও প্রকৃতির নিত্য পরিচিত উপকরণ ধাঁধার বিষয়বস্তু। ধাঁধার ব্যবহারে সৌন্দর্যবোধ, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা, সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, চিন্তার উৎকর্ষতা, মননশীলতা, কৌতুক সৃষ্টি, স্মৃতিচর্চা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি ধাঁধার নমুনা —

১. মামাদের লাল গাই/হাত দিলে টাকা হয়। উত্তর — কেন্নো।

২. বাপ থাকলো প্যাটে/ব্যাটা যেল্‌ছে হাটে। উত্তর — কলার থোড় ও কাঁচাকলা।

৩. কালো গাই কালশা/দুদ্ দ্যায় এক মালসা। উত্তর — মেঘ ও বৃষ্টি।

৪. কাঁচাতে তুলতুল পাকাতে সেঁদুর/এই কাটানটো যে না বলতে পারবে/তার বাবা আস্ত একটো এঁদুর। উত্তর — মাটির হাঁড়ি।

৫. মামাদের কালো গাইটি, লালায়-খোলায় চরে/ভাঁক্ কর লেথিং দিলে গোটা প্যাটটো ভরে। উত্তর — সেচের কাজে ব্যবহৃত দ্রোণ (লালা — নালা, খোলা — অনুকার শব্দ, লেথিং — লাথি মারলে, প্যাট — পেট)।

৬. মামারা পালিং গ্যালো/ঘরের গিন্নি ঘরেই থাকলো। উত্তর — ইঁদুর।

৭. এক থালা সুপ[অ]রি/গুণতে লারে ব্যাপারি। উত্তর — আকাশ ও তারা (ব্যাপারি — ব্যবসায়ী, লারে - পারে না)।

৮. লাহাঙে বসলো বুড়ি/সুবুজ কাপড় পরে/পুজ[অ] কোত্তে বসলো বুড়ি/ হোলদ্যা কাপড় পরে। উত্তর — কলার কাঁচা অবস্থা থেকে পাকা অবস্থায় রূপান্তর। (লাহা — স্নান করে, সুবুজ — সবুজ, হোলদ্যা — হলুদ রঙের)।

৯. রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই / বারে বারে ভেন্‌নু হয়। উত্তর — দরজা (ভেন্‌নু — পৃথক)।

খ. প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদের সংজ্ঞা হিসেবে লোকসংস্কৃতির অন্যতম পথ প্রদর্শক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন — "প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি; ইহা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন আবার তেমনই অন্যদিক দিয়া আধুনিক — ইহা পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।"[৪১] প্রবাদে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ বাক্য থাকে। প্রবাদের উদ্ভব লোকের এবং জাতির দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতা (Long Experience) এবং পরিণত বুদ্ধি (Elder Wisdom) থেকে। প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় মানুষের আঞ্চলিক পরিবেশ, ঋতু, প্রকৃতি ও সমাজগত পরিচয়। ফলে প্রবাদ বর্তমানে জাতিতত্ত্ব বিচারের শক্তিশালী উপকরণ রূপে বিবেচিত হয়। এতদঞ্চলে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রবাদের নমুনা —

১. বাপের কালে নাইখো গাই/চালুন নিঙে দ'তে যায়।

২. নিজের ধা[ই]ত ধরে/অপরের চিকিস্‌স্যা।

৩. মূলে মা[ই]গ্‌ নাই ফুল শয্যা। (মা[ই]গ্‌ — স্ত্রী)

৪. জন, জামাই, ভাগন্যা,/খিঁচতে দিয়ো না আ[ই]গ্‌ন্যা।

৫. সাধের কমললোচন/খুদ সিজ্যাতে নুন জোটে না/পুলাপ্‌ খাবার মন।
(খুদ — ভাঙা চাল, পুলাপ্‌ — পোলাও)

৬. যেদিকে ডগভারি/ সেদিকে গৌরহরি।

৭. ঢেক বাঁশে ডোম কানা।

৮. যার বিয়্যা তার মনে নাই/পাড়া পড়শির ঘুম নাই।

৯. ইড্ডিং কোল্ল্যাম, ফিড্ডিং কোল্ল্যাম, কাপড় দিল্যাম ধুতে/নাং এর মুখে ছাই পড়ল ভাতার এলো লিতে। (ইড্ডিং ফিড্ডিং — অতিরিক্ত সাজগোজ, নাং — উপপতি)

১০. জামাইয়ের লেগে মারে হাঁস/ঘরসুদ্দ[অ] খায় মাস।
(ঘরসুদ্দ[অ] — ঘরসহ, মাস — মাংস)

১১. কপালে নাইখো ঘি/ঠক্‌ঠকালে হবে কি।

১২. বাপ বরাবর নাম নাই/কুঁচ্যা কোঁড়ার লাতি। (কুঁচ্যা — কেঁচো, কোঁড়া — খনন করা)

১৩. কচুর এঁঠ্যা, মানুষের বেঁঠ্যা।

১৪. প্যাট ভরলে ল্যাট রাজা। (ল্যাট — লেট নামক জাতি বিশেষ)

১৫. লিধ্ধোন্যার ধন হলে দিনে দ্যাখে তারা/আর লিভ্ভাতারির ভাতার হলে ঘোরে পাড়াপাড়া। (লিধ্ধোন্যা — নির্ধন ব্যক্তি, লিভ্ভাতারি — স্বামীহীনা)

১৬. নিজের চারে/পরের গোই ল্ কাড়ে। (চার — আগ্রহ, গোই ল্ — গোয়াল)

১৭. বিটি ভাঙলে কাঁসি, তো পাড়াসুদ্দ হাঁসি/আর বউ ভাঙলে সরা, তো পাড়ায় পাড়ায় ব্যাড়া। (কাঁসি — ছোট কাঁসার থালা, ব্যাড়া — বেড়ানো)

১৮. দিন য্যালো আলে ডালে/ধান শুকছে জোস্তার আলে। (আলেডালে — এখানে ওখানে, জোস্তা — জ্যোৎস্না, আলে — আলোয়)

গ. ছড়া ঃ

ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া, বাল্যক্রীড়ার ছড়া, রথের ছড়া, খেলার ছড়া পৌষ আগলানোর ছড়া, সাঁজ পূজানীর ছড়া, বিয়ের ছড়া, নবান্নের ছড়া, পুণ্যিপুকুর ব্রতের ছড়া, ঢেঁকির ছড়া প্রভৃতি নানাধরনের ছড়ার দেখা মেলে আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে। ছেলে ভুলানো ছড়া বা ঘুম পাড়ানি ছড়ার মূল উপজীব্য শিশু। যদিও শিশুরা এই ছড়াগুলি আবৃত্তি বা উচ্চারণ করে না। শিশুরা তো চিরনতুন, চিরপুরাতন সহজ সরল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন — "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানুষের কত পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংকলন, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬)। সেই চিরসবুজ শিশু মনকে ভোলাতে কত না ছড়ার আয়োজন। যেমন নিচে উদ্ধৃত ছড়াটিতে সন্তান কাছে থাকলে ক্ষুধা তৃষ্ণাও যে তেমন কষ্ট দেয় না তা ধরা পড়েছে —

আঁচিরে পাঁচিরে ঝিঙ্যার লতা/ঝিঙ্যা ক্যানে ধরে না/আমার ছেল্যাকে ব্যাড়াতে নিঙে গেলছে/মা চেনে না।/ধনকে নিঙে বনকে যাবো /বনে খাবে কি/মুকে মুক দিঙে বোসে থাকবো/প্যাটের জ্বালা কোত্তে পারবে কি?

এখানকার আঞ্চলিক ছড়ার মধ্যে সমাজ, পরিবার, এমনকি পরিবারের পরিপাটির ছবিটিও দুর্লক্ষ নয়। যেমন নিম্নোক্ত ছড়াটিতে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে —

আলতা নুড়ি/গাছের গুঁড়ি,/জোড়পুথুলের বিহ্যা,/অ্যাতোটাকা লিলেন বাবা/দূরে দিলেন বিহ্যা।/অ্যাখোন ক্যানে কাঁন্ছেন বাবা/গামছা মুড়ি দিঙ্যা।/আগে কান্দে মা বাপ/ পেছে কান্দে পর//পরপদ্যে লেখে দিল্যাম/যাবা শ্বশুর ঘর।/শ্বশুরদের ঘরখানি ব্যাতের ছাহনি/তাতে বসি পান খায় মা যশোদা রানি।/অ্যাক খুড়িতে ঘিয়্যা চন্দন, অ্যাক খুড়িতে দুদ্,/মাকে যেঙি বলো গা বিটির বড়ো সুক।/মা তো পেট্যালি পাই ট্ করছে/বাবা তো গুরুজন নৌকা[অ] সাজাছে।/দাদা

তো চণ্ডাল ব্যালা দ্যাখাছে/ বো তো শিতুলি সেঁদুর পড়ছে।/ব্যালা করে ঝিকিমিকি গলা করে কাট/কতোক্ষণে যাবো রে ভাই হর্‌গৌরীর মাট।/হর্‌গৌরীর মাটে রে ভাই ঝুরঝুর‍্যানি বালি/চাঁদমুখীকে রো ই দ্ লেগেছে তুলি ধরো ডালি।/ও ও বনমালী।

নিম্নে উক্ত ছড়াটি চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি মুড়ে পায়ের পাতার উপর শিশুকে বসিয়ে নাচাতে নাচাতে শিশুর বায়না ভোলানো কিংবা ঘুম তাড়ানোর উদ্দেশ্যে বড়রা আবৃত্তি করতে থাকে —

'ঘুগুচ্চু/প্যাটেফু।/—কি ছেল্যা?/ব্যাটা ছেল্যা।/—ছেল্যা কোই?/চিলে নিঙেছে।/—চিল কোই?/ডালে বোসেছে।/—ডাল কোই?/পুড়িং দিঙিছি।/—পুড়া কোই?/ছাই হোল্‌ছে।/—ছাই কোই?/ভুঁঙে দিঙিছি।/—কোনদিকে পোড়্‌ব্যা?/—গু দিকে না সুনা দিকে?/সুনাদিকে।/' তারপর শিশুটিকে কল্পিত সোনাদিকে শুইয়ে দেওয়া হয়।

এখানকার গ্রামের বর্ষীয়ান মহিলার মুখে সাংসারিক নানা প্রসঙ্গ হঠাৎ হঠাৎ উঠে আসে ছড়ার দুকলিতে, যাতে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক্ষীরের মতো সারাৎসারে পরিণত। যেমন, গুদা পা তুলতে লারি,/সেই ধান কুটা করাল্যা হরি। কিংবা, দুনিয়ায় কে সতী?/ জোটিল্যা কুটিল্যা বলে/আমরা দুই মা বিটি। বা, ব্যাটা নাই তো বিটি বাবু/দুধ নাইখো জলে সাবু। ইত্যাদি।

ঘ. লোকসঙ্গীত ঃ

বীরভূম জেলা বাউল ফকিরের দেশ। বীরভূমের লালমাটি আর বাউল একে অন্যের পরিপূরক। বীরভূমের আকাশে বাতাসে বাউলের সুরধ্বনি এক অচিন দেশে নিয়ে চলে যায়। গেরুয়া পোষাক, 'ধমিল্ল' করে বাঁধা চুল, পায়ে ঘুঙুর আর বগলে 'গাব্‌গুব[অ]' নিয়ে বাউলের আনাগোনা বীরভূমবাসীর কাছে খুব চেনা ছবি। শুধু বাউল কেন, বীরভূম তথা আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্র গোটা বছর জুড়েই কোনো না কোনো উৎসব-পার্বণে, লোকগানে পরিপূর্ণ থাকে। ভাদ্রমাসে ভাদুর গান ও ভাজুই বা ভাজো, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ধর্মরাজের বোলান কোথাও বা চিয়্যান, চৈত্র-বৈশাখে শিবের গাজন। এছাড়াও বছরভর কবি, আলকাপ, তরজা, বেহুলা-ভাসান, ঝাঁপান, টহল, প্রভাতী-সঙ্গীত, নগরকীর্তন, হরিনাম, হাপু গান, ঝুমুর, পট সঙ্গীত, গোয়ালিয়া গান, রামযাত্রা, ভাঁটের গান প্রভৃতি লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইসব লোকসঙ্গীত গ্রামবাংলার একঘেয়েমি জীবনের অচলায়তনে এনেছে গতিজাড্যের জোয়ার। এইসব লোকসঙ্গীতের দু-একটি নমুনা নিচে তুলে ধরা হল —

বাউল ঃ

আমার বাউল ঘরে জন্ম য্যানো/হয় গো বারে বার।/আমি চাই নারে সুক্/দাও ভরা দুক্/ওগো অন্তরে আমার।/আমার বাউল ঘরে জন্ম য্যানো/হয় গো বারে বার।/আমার একতারা হোক জীবনসঙ্গী/দুঃখ পারাবার/আমার কুঁড়েঘরে দারুণ শ্রাবণ/বাঁধে প্রীতির ঘর।

গোয়াল ও গোরুর গান ঃ

চালভাজা কলাই ভাজা গো[ই]লে বসে খায়,/মাঠে মরে হালের বলদ ঘরে মরে গাই।/ দোফোর ব্যালায় টিকি যে গো ধম্‌ধম্‌ করে,/তার হাতে লক্ষ্মী ছেড়ে অন্য হাতে পড়ে।/শো[ই]ন্‌ মোঙোল বারে যে গো গোবর দ্যায়।/তার হাতে লক্ষ্মী ছেড়ে অন্য হাতে যায়।/বারো গাছের নারকেল, ত্যারো গাছের তাল,/তার নীচে পেতে আছে কামার বুটা শাল।/ মো'লো মো'লো বেন্যারে তোর মাথায় পড়ে বাজ/অ্যাতো দেব্‌তা থাকতে ক্যানে ভগ্‌বতীর ওপর বাদ।/এইসব কথাগুলা যে পালন করে,/তার ঘরে লক্ষ্মী, ভগ্‌বতী বির‍্যাজ করে।

ব্যাঙের বিয়ের গান[৪২] ঃ

উসকটি রে মারুয়া ঝিঙের ফুলের সেহেরা
সইকে পাঠালছি গোহালপাড়া।
হোল্যারা সাত ভাই হাল বুহাতে যায়
হালের লড়ি চালে গুঁজি মত্যে গাইতে যায়।
মত্যে নামরে নাম্‌।
মেঘুদাদা উপ্যাসি খাঁসা চিড়্যা ভিজ্যালছি
সইকে পাঠাল্‌ছি গোহালপাড়া।
গাছে ম'ল পাখপেখালি ভুঁয়ে ম'ল ধান
মত্যে নাম রে নাম।
আকাশেতে নাইরে পানি কিসে হবে ধান
মত্যে নামরে নাম।

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ, সরল সাদাসিধে মানুষ, বিচিত্র তাদের খাদ্যাভ্যাস — এ সবেরই মিলিত ফল বীরভূম এবং তার অন্তর্গত আমাদের ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলার আঞ্চলিক সমীক্ষা ক্ষেত্রটি। মাটির মানুষ, মাটির কাছাকাছি মানুষ এবং তাদের কথ্যভাষাকে নিয়েই আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি, শব্দভাণ্ডার প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

উল্লেখপঞ্জি

১. মিত্র, শ্রীগৌরীহর — বীরভূমের ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ১৭।
২. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য — বীরভূম সমগ্র, ১ম ভাগ, পৃ. ১৫।
৩. গুপ্ত, রঞ্জন — রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ, পৃ. ৩০।
৪. রায়, শঙ্করলাল — 'বীরভূম' নামের উৎস সন্ধানে, পৃ. ৭।
৫. 'বীরভূমি' শতবর্ষ পূর্তিসংখ্যা (১৩০৬-১৪০৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫২।
৬. মজুমদার, অর্ণব — বীরভূম ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৯।
৭. রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫।
৮. চট্টোপাধ্যায়, ড. অনিমেষ — প্রসঙ্গ ঃ উত্তর রাঢ়, পৃ. ৩।
৯. District Statistical Handbook, Birbhum - 2006, Govt. of West Bengal, Page - 72.
১০. মজুমদার, ড. অর্ণব — বীরভূম ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃ. ৮৫।
১১. ঘোষ, বিনয় — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃ. ২৮৪।
১২. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (প্রকাশিত) এবং চক্রবর্তী, মহিমানিরঞ্জন (সম্পাদিত) — বীরভূম বিবরণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।
১৩. মিত্র, ড. অমলেন্দু — রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, পৃ. ১৫১।
১৪. মিত্র, শ্রীগৌরীহর — বীরভূমের ইতিহাস, পৃ. ৪৩।
১৫. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য — বীরভূম সমগ্র, ১ম ভাগ, পৃ. ১২।
১৬. ঘোষ, বিনয় — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃ. ২৭৭।
১৭. হান্টার, ডবলু. ডবলু., চট্টোপাধ্যায়, অসীম (অনুবাদক) — গ্রাম বাংলার ইতিকথা, পৃ. ১৪০।
১৮. চৌধুরী, অরুণ — সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম, পৃ. ১৪।
১৯. গুপ্ত, রঞ্জন — রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ, পৃ. ৪১১।
২০. রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৬২।
২১. চক্রবর্তী, দেবকুমার — বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, পৃ. ৭২।
২২. রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৬৪।
২৩. District Statistical Handbook, Birbhum - 2006, Govt. of West Bengal, Page - 5.
২৪. রায়, বরুণ (সম্পাদক) — বীরভূমি বীরভূম, পৃ. ২৯৩-৩০৩।
২৫. 'পশ্চিমবঙ্গ', বীরভূম জেলা সংখ্যা, ১৪১২, পৃ. ৩০।
২৬. চক্রবর্তী, দেবকুমার — বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, পৃ. ৩।

২৭. O' Malley, L.S.S. — Bengal District Gazetteers, Birbhum, Page - 4.
২৮. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর — রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ. ৪৪।
২৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, তাং ১৮.৯.২০০৯, পৃ. ৪।
৩০. তথ্যসূত্র ঃ আবহাওয়া দপ্তর, ভারত সরকার, District Statistical Handbook, Birbhum - 2006, Govt. of West Bengal, Page - 2.
৩১. O' Malley, L.S.S. — Bengal District Gazetteers, Birbhum, Page - 9.
৩২. রায়, বরুণ (সম্পাদক) — বীরভূমি বীরভূম, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৯।
৩৩. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর — রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ. ৬৮।
৩৪. সুর, অতুল — বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃ. ৫৩।
৩৫. হান্টার, ডবলু. ডবলু., চট্টোপাধ্যায়, অসীম (অনুবাদক) — গ্রাম বাংলার ইতিকথা, পৃ. ১১৪।
৩৬. বাংলা পিডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭।
৩৭. নয়া প্রজন্ম, ১৯ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২৭/১/১০, পৃ. ৬।
৩৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭/১২/২০০৯, পৃ. ৮।
৩৯. করণ, ড. সুধীর কুমার — সীমান্ত বাংলার লোকযান, পৃ. ২।
৪০. চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার (সম্পাদক), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষের অন্তর্গত প্রবন্ধ; ভৌমিক, নির্মলেন্দু — বাংলা ধাঁধার ভূমিকা, পৃ. ১৯০।
৪১. চৌধুরী, ড. দুলাল (সম্পাদক) — লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পৃ. ১০১।
৪২. গানটি চট্টোপাধ্যায়, ড. অনিমেষ — প্রসঙ্গ ঃ উত্তর রাঢ়, গ্রন্থের ৩৪২ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া।